দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ॥ একটি পর্যালোচনা

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের এতদিনকার বিদ্যমান নীতিহীন শিক্ষানীতি বিষয়ক অচলাবস্থার একটা সুষ্ঠু সুরাহা হবে। আর সে ব্যাপারে নতুন করে আশাবাদ ব্যক্ত করার মতো সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে আধুনিক গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ সেপ্টেম্বর)। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে, বহুল আকাঙ্ক্ষিত এ শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণাটি দেয়ার জন্য।

সুজন কবির

এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। আমাদের চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং পরিশেষে শিক্ষার মতো একটি স্পর্শকাতর সেক্টরের ক্ষেত্রেও হালবিহীন তরী নিয়ে আমরা অথৈ সময় সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি। আমাদের সামনে কোন দিকদর্শন নেই নেই কোন সুস্পষ্ট নীতি। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘ দুই যুগের জমানো অব্যবস্থাগত জঞ্জাল এবং আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সবকিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য সেই বহু বলা কথাগুলো আবারও বলতে হচ্ছে। বলতে হচ্ছে প্রসঙ্গক্রমেই।

ইংরেজ আমল বাদ দিলে পাকিস্তান আমল থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় চক্রান্ত। শাসকগোষ্ঠী এ অঞ্চলে তাদের শাসন-শোষণ পাকাপাকিভাবে স্থায়ী করার জন্য বার বারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফেলে রাখতে চেয়েছে অনাধুনিক মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার গণ্ডিতে। '৫৯ সালের শরিফ কমিশন, ৬৪-এর হামিদুর রহমান কমিশন, '৬৯-এর নূর খান কমিশন-এরূপ প্রত্যেকটি কমিশনেরই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রাধান্য দেয়া, শিক্ষাকে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য সহজসাধ্য করে তোলা। সে লক্ষ্যে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করা এবং শিক্ষা মাধ্যমের ক্ষেত্রে বাংলাকে গুরুত্বহীনতার সাথে বিবেচনা করা। শাসকগোষ্ঠী কোন কমিশনের রিপোর্টই পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করতে পারেনি। বারবারই সচেতন ছাত্র সমাজ উত্তাল আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্দিষ্ট কমিশনটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত না হলেও শাসকগোষ্ঠীর আরোপিত রাষ্ট্র দর্শনের কুপ্রভাব থেকে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাটি মুক্ত রইল না। আর এমনি করেই রংবেরঙের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কর্তৃক অবহেলিত হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। এ সত্যটি উড়ে এসে জুড়ে বসা পাকিস্তানী শাসকদের বেলায় যেমন সত্য, তেমনি এর সত্যতা রয়েছে বাংলাদেশ পর্বের শাসকগোষ্ঠীর বেলায়ও। মুক্তিযুদ্ধের পরপর '৭২ সালের ২৬ জুলাই গঠিত হলো কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। দীর্ঘ দুই বছর যাবত কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে '৭৪ সালের মে মাসে তার রিপোর্ট পেশ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এ দেশটিতে জাতিগতভাবে উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত ছিল (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি)। রিপোর্ট পেশ হবার পর বঙ্গবন্ধু সরকারও প্রস্তুতি নিচ্ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সুপারিশগুলো কার্যকর করার।

তারপর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর শুধু শিক্ষা কেন সকল ক্ষেত্র নিয়েই শুরু হলো নির্মম পাশা খেলা। রাজঅমাত্যবর্গের এ পাশা খেলার মাসুল গুনতে হলো পোড় খাওয়া জনগোষ্ঠীকে। জিয়াউর রহমানের আমলে কাজী জাফরের উদ্যোগে গঠিত হয় একটি শিক্ষা কমিটি। এরশাদ আমলে মজিদ খানের শিক্ষানীতি এবং তার প্রতিক্রিয়ায় উত্তাল আন্দোলন এই কমিটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু এটুকু বলা যায়, এ সরকারগুলোর শাসনামলে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে শিক্ষাবিদদের দ্বারা কমিটি, বিশেষজ্ঞ পরিষদ, সেমিনার ইত্যাদি ভূরি ভূরি হলেও বিষয়বস্তুগত কোন পরিবর্তন আসেনি। সব প্রতিবেদনেরই ঝোঁকটা ছিল পাঠ্যসূচীতে ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া, পাশাপাশি দু'টি স্বতন্ত্র অথচ চরিত্রগতভাবে রাইভাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু রাখা। পাকিস্তানীরা চলে গেছে কিন্তু তাদের শিখিয়ে যাওয়া রাষ্ট্র দর্শন আমাদের দেশী শাসকগোষ্ঠী ঠিকই বজায় রেখেছে। আর সে জন্যই এরশাদ সরকার আপামর জনসাধারণের ধর্মানুভূতি থেকে ফায়দা লুটার জন্য ইসলামকে ঘোষণা করল রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই উদ্ভট দর্শন এখনও গোটা জাতির ঘাড়ে চেপে আছে মামদো ভূতের মতো। অথচ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য ইংরেজরা কিন্তু শিক্ষা দর্শন নিয়ে এরকম লুফোলুফি করেনি। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো বশংবদ কেরানি বানাবার কারখানা হিসাবে দেখা গেলেও তাদের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল এক ধারার লোকায়ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

এখানে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা দর্শন না থাকলে সমগ্র ব্যবস্থাটিই অকার্যকর ও বন্ধ্যা হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমনটি হয়েছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে। অব্যবস্থাগত কারণে হাজারও রকমের সমস্যা ডালপালা বিস্তার করছে দিন দিনই। আর এমনি করেই শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি হারিয়ে গেছে। সে জন্য আজকের শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটাই যদি হয় শিক্ষা শেষে একটি ভাল মাপের চাকরি, তাহলে তাদের খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। কারণ গোড়া থেকেই তাদের পরিচালিত করা হয়েছে ভুল পথে। আর তাই আমাদের আজকের শিক্ষাদাতাদের মনে সুস্পষ্টভাবে এই ধারণাটি থাকা বাঞ্ছনীয় যে, শিক্ষা কি, কেন, কিভাবে এবং তার ফলটাই বা কি? এই চার মূলনীতির কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে সাদামাটাভাবে শিক্ষা সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, যে প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি বা সমষ্টির জ্ঞান, কর্মক্ষমতা, চরিত্র ও মানসিক উৎকর্ষতার ক্রমবর্ধমান বিকাশ ঘটানো যায় তাই শিক্ষা। এ প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা সম্পর্কিত দর্শনটি। আর এ দর্শনটি নির্ভর করবে রাষ্ট্র শিক্ষাকে কিভাবে দেখে সেই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি হলো রাষ্ট্র দর্শন পরিবর্তন হবার সাথে সাথে শিক্ষা দর্শনের পরিবর্তন ঘটা। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় একেক সরকার আসে আর ইচ্ছামাফিক যত্রতত্র পরিবর্তন বা বাতিল করার রাজনীতিতে নিমগ্ন থাকে। এর ফলস্বরূপ শিক্ষার গতি বা প্রবহমান ধারায় হঠাৎ করেই অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। যা শুধু শিক্ষার্থীর জন্যই নয়, পুরো জাতির জন্যই ক্ষতিকারক। আমাদের রাজনীতিকরা একটি বিষয়ে উদার হলে আধুনিক গণতন্ত্রমনস্কতার পরিচয় দেবেন, আর তা হলো শিক্ষা, দর্শন ও শিক্ষানীতিকে সরকার পরিবর্তন বা রাষ্ট্র দর্শনের উর্ধে রাখা। বিষয়টি তো খুবই স্পষ্ট যে, একটি দেশে বিভিন্ন মত ও দর্শনের রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট সময়ান্তর ক্ষমতায় আসবে-তারা সবাই যদি নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে শিক্ষা দর্শনটিকে গুলিয়ে ফেলেন তাহলে ঐ জাতি কোনদিনই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। আর সে জন্যই শিক্ষা দর্শন নিয়ে এ জাতীয় লোফালুফি কর্মকাণ্ড আমাদের বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা হবে সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সংস্কৃতি অবশ্যই নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণপূর্বক। আর শিক্ষানীতি-শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এসবকে ঘিরেই। তা হবে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং ব্যবস্থা বা Policy আর একটি Policy কার্যকর ফল দেবে তখনই যখন তা পরিকল্পনামাফিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে এবং স্থায়িত্ব পাবে।

এবারে আসি কুদরত-ই খুদা-শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে। বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে আঠারো সদস্যের এক কমিটি বাংলাদেশের শিক্ষানীতি কি হবে এ প্রসঙ্গে ৪৮০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে জাতীয় শিক্ষা দর্শনের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে এভাবে যে, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্টবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।' এছাড়াও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ' দেশপ্রেম সুনাগরিকত্ব ও মানবতা এবং বিশ্ব নাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা, প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে শিক্ষা, কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা, সামাজিক অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা।'

(চলবে)